গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

খনগান ঃ লোকসঙ্গীতের দর্পনে

খন

১। খনগান ঃ সাধারণ পরিচয়

২। খনগান ঃ নামকরণের প্রাসঙ্গিকতা

৩। খনগান ঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত

৪। খনগান ঃ আসর ও সময়ের নির্দিষ্টতা

৫। খনগান ঃ অখণ্ডিত অঞ্চল

৬। খনগান ঃ পর্ব থেকে পর্বান্তরে

৭। খনগান ঃ কলাকুশলীর আত্মার আত্মীয়

৮। খনগান ঃ বিশেষ বৈশিষ্ট্য

৯। খনগান ঃ পর্বান্তরের কারণ

১০। খনগান ঃ শিল্পীদের আর্থসামাজিক অবস্থান

১১। খনগান ঃ গৌড়বঙ্গের কয়েকটি দল

১২। খনগান ঃ পরিসরের সীমাবদ্ধতা

১৩। তথ্যসূত্র

খনগান ঃ সাধারণ পরিচয়

বাংলা লোক নাটক গুলির মধ্যে 'খন'-এর একটি বিশেষ স্থান ও মর্যাদা আছে। বিশেষ করে গৌড়বঙ্গের লোক নাট্যের মধ্যে রুচি ও পরিশীলতার দিক দিয়ে গম্ভীরাগানের পরেই তার স্থান। মূলত দেশী-পলিয়া-রাজবংশী এলাকায় এর জনপ্রিয়তা হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই লোকনাট্যের রসাস্বাধন করে থাকে। এই গানের অংশ গ্রহণ কারিদের মধ্যে অধিকাংশই পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন। দর্শকাসনেও সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকরা থাকেন। 'খন গান'— গান নামে পরিচিতি লাভ করলেও আসলে এক প্রকার লোকনাট্য। সে আলোচনা আমরা বিস্তারিত ভাবে পরবর্তী অংশে করব।

লোক নাট্যে যেমন বিশিষ্ট একটি অঞ্চলে থাকে তেমনি থাকে কতকগুলি পর্ব বিভাগও। খন গান ও তার ব্যতিক্রমী নয়। অঞ্চল বলতে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা। বর্তমানে তিন খন্ডে বিভক্ত। কিছু অংশ অধুনা বাংলাদেশে এবং অন্য অংশ ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ-এর প্রধান দুটি জেলা উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। এ অবস্থাতেও পূর্ণাঙ্গ দিনাজপুরের রূপ পাওয়া যায় না, যদি না পাশ্ববর্তী মালদা জেলার গাজোল এবং বামনগোলা ব্লক জুড়ে দেওয়া যায়। কেননা ১৮১৩ সালে ইংরেজ সরকার তার শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজশাহী দিনাজপুর এবং রাজমহল ডিভিশনের কিছু অংশ নিয়ে অধুনা এই মালদা জেলা গঠন করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবে খনগানের অঞ্চল বিস্তার এ সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপর, মালদার কিছু অংশ এবং বাংলাদেশের কিছু অংশে এই খন গানের প্রাধান্য।

অন্যান্য লোক নাট্যের মত খন গানেও বেশ কয়েকটি অংশ আছে।

১। মুখ পাদ

২। বন্দনা গান

৩। নাচারি

৪। মূল পালা গান।

যদিও কোন কোন খন গানের দল তাদের জনপ্রিয়তা এবং অধিক লোক সমাগমের জন্য বর্তমানে জনপ্রিয় হিন্দী বাংলা গানের মিশ্রনে নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থাও করছে। তবে বেশিরভাগ খনের দলই এখনও খনগানের মূল কাঠামোতে আটকে আছে।

আমরা জানি লোক নাটকের দুটি বিভাগ—

১) আনুষ্ঠানিক।

২) অনানুষ্ঠানিক। 'খনগান' মূলত অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য।

খন গান রচনার মূল বিষয় সাধারণত, সামাজিক হলেও তার মধ্যে রাজনীতি ও অর্থনীতির কথা খুব সরাসরি ভাবে না হলেও যথেষ্ঠ গুরুত্ব পায়। ফলে খন গানের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়— অবৈধ প্রেমের কেচ্ছা, দরিদ্র কৃষকের সংসার, নিরক্ষরতা, জন্ম নিয়ন্ত্রন, বন্য কবলিত দিনের ঘটনা, তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি। অনুষ্ঠানের দীর্ঘতা ২/৩ ঘন্টা থেকে গোটা রাত্রি। দর্শক, অবালবৃদ্ধবনিতা। মহিলাদেরও ছিল অবাধ গতায়ত। অন্যান্য লোকনাট্যের মতোই খনগানও পরিবেশিত হয় খোলামাঠ বা বাড়ির বড় উঠোনে। গোটা বছর কম বেশি অনুষ্ঠান চললেও মূলত অঘ্রাণ মাস থেকে ৩/৪ মাস এই গানের দলগুলি বেশি ব্যস্ত থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক বিষয়ের উপর অল্প শিক্ষিত লোকেরাই এই লোকনাট্যের মূল পরিবেশক। সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মানুষই এই লোকনাট্যর দর্শক ও শ্রোতা হলেও বাবু কালচার-এর লোকেরা তেমন পছন্দ করেন না বললেই হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নানা চর্চায় যে কোনও লোকনাটক একটি অপরিহার্য উপাদান। আবার বাংলা লোকনাট্যধারার একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যয় হল 'খনগান'। গম্ভীরা, আলকাপ, ডোমনি প্রভৃতি লোকনাটককে যেমন মূল নামকরণের শেষে 'গান' —এই শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে; তেমনি 'খন' -এর মূল নামের সঙ্গে 'গান' শব্দটি যুক্ত হয়ে 'খনগান' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

খনগানের উৎপত্তির নির্দিষ্ট কোন সন-তারিখ পাওয়া যায় না বটে, তবে কোন কোন গবেষক মনে করেন ৩০০ বছরেরও বেশী প্রাচীন এই খনগান, কিন্তু আমরা এখনও তার বিশ্বাসযোগ্য কোনো তথ্য পাইনি। আমাদের বিশ্বাস চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব আন্দোলনের সমসাময়িক কিংবা তার পরবর্তীকালে এই গানের উদ্ভব। দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি পালাগান, মূলত পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়ে গান করে মাঙন নেওয়ার প্রথা চালু ছিল। এই সংস্কৃতি বৈষ্ণব আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে তৈরী হয়।

খনগান ঃ নামকরণের প্রাসঙ্গিকতা

গৌড়বঙ্গের তিন জেলা তথা দুই দিনাজপুর এবং মালদা জেলার উত্তর পূর্বাংশের দুটি থানা -গাজোল এবং বামন- গোলাতেই এই খন গানের প্রচলন অপেক্ষাকৃত বেশি। খনগানের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন গবেষকেরা আলোচনা পর্যালোচনা করলেও এখনও পর্যন্ত তার নামকরণের ইতিহাসের যথার্থতা বা নামকরণের অর্থ নিয়ে কেউই একমত হতে পারেন নি। ফলে সকলের কাছ থেকে একে একে উঠে এসেছে নানা ধরণের মতবাদ। তাতে মত পার্থক্যও দেখা দিয়েছে। আমরাও 'খন' এই নামকরণ নিয়ে আমাদের মতামত ব্যক্ত করব পর্যায়ক্রমে —

প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করি খন গানের প্রথম ও প্রধান গবেষক শ্রী শিশির মজুমদারের বক্তব্যকে। তিনি 'খন' কথার অর্থ করেছেন—

" 'খন্' শব্দটি জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ক্ষেত অর্থে ব্যবহৃত। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা থেকে সংগৃহীত একটি নাটুয়া গানের পালায়। 'খন্ড' কথাটি পাওয়া যায়। 'খন্ড' হল ঘটনা। বাংলায় 'কান্ড' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন একটা কান্ড হয়েছে। তেমনি পশ্চিম দিনাজপুরের দেশী পলিরা বলেন 'খন্ড'।[১]

গবেষক শ্রী শ্রীহর্ষ মল্লিকের মতে "খন্ড বা খন কাহিনীর অপভ্রংশ হল খন।"[২]

দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি গবেষক ও খন গানের গ্রন্থ প্রণেতা, শ্রী ধনঞ্জয় রায় খনগান সম্পর্কে বলেন—

'খন' কথাটির অর্থ কলঙ্কজনক ঘটনা'।[৩]

গবেষক রায়ের 'জানা অজানার দিনাজপুর' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। তার প্রায় দীর্ঘ ১ দশক পরে ২০০৯ সালে খনগান নিয়ে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'খন' প্রকাশিত। এই গ্রন্থে তিনি 'খন' শব্দটি নিয়ে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর সেই বক্তৃতায় দীর্ঘ উক্তিটি আমরা একবার দেখে নিতে পারি—

" 'খন' শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে ক্ষণ, মুহূর্ত, ধাতুময় যন্ত্রাদির শব্দ, খনন, গভীর, শুভক্ষণ, খেত ইত্যাদি। ব্রজবুলি ভাষায় 'খন' শব্দের অর্থ এখন বা অখন—এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অ-এখন। "করবে খন" "হবে খন" ইত্যাদি। 'খন'—খন্ ধ্বনির অনুকরণ

শব্দ এবং ধাতু নির্মিত জিনিসের আঘাত শব্দ অথবা ধাতুপাত্র বা ধাতুময় যন্ত্রাদির শব্দ। প্রয়োগ করলে এরকম দাঁড়ায়, খন্ করে শব্দ হল (Usage, illustration)।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'খঅন্' কে আহার বলে। প্রয়োগ, কে ইবাখন্। আবার 'খচ' নামে একটি শব্দ পাওয়া যায়, যার অর্থ হঠাৎ। রংপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষায় 'খন' শব্দের অর্থ বলা হয়েছে মৌসুম। দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার আঞ্চলিক ভাষায় 'খন' কথার অর্থ রবিশস্য বলা হয়েছে। সিলেট জেলার আঞ্চলিক অভিধানে 'খন' কে শুভক্ষণ অর্থে চিহ্নিত করা হয়েছে।"[৪]

' 'খন' অর্থে ক্ষণ বা মুহূর্ত কে বুঝিয়েছেন।'[৫]

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে আমরা লক্ষ্য করেছি। ' 'খন' অর্থে ক্ষণ শব্দের কোমল রূপ, মুহূর্ত, ভবিষ্যৎ অর্থবোধক।'[৬]

বাংলা একাডেমী, বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে আমরা খন কথার অর্থ পাই এভাবে—' 'খন্' অর্থে মৌসম। সাধারণত রংপুর জেলা এবং তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।'[৭]

সরল বাংলা অভিধানকার সুবল মিত্র 'ক্ষন' অর্থে উৎসব বুঝিয়েছেন। অতি সুক্ষ্ম কাল, সময়, মুহূর্ত, অবকাশ, পর্ব কে বুঝিয়েছেন। 'ক্ষন' এর দেশিরূপ- 'খন'।[৮]

বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ' 'খন্' শব্দের অর্থ করেছেন খনন করা বা বিদার। তিনি তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখিয়েছেন সং. খন্ > প্রা. খণ বা খন।'[৯]

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও লোকসংস্কৃতি গবেষক বৃন্দাবন ঘোষ তার "উত্তর দিনাজপুরের 'খন' ঃ সমীক্ষা-১' প্রবন্ধে 'খন' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— " সংস্কৃতি 'ক্ষন' থেকে 'খন' শব্দের 'উৎপত্তি' ক্ষন বলতে সময়কে বোঝায়।"[১০]

খনগান ঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত

খনগান, লোকনাট্যের অন্যতম আঙ্গিক। লোক সংস্কৃতির গবেষকদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। যদিও খন গান নিয়ে গবেষকরা এখনও পর্যন্ত তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। কেবলমাত্র কয়েকজন সাধারণ গবেষক এবং আশপাশের জেলার গবেষকরা কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করলেও প্রথাগত গবেষণাধর্মী অধ্যায়ণ প্রায় কেউই তেমন করেন নি। ফলে এই আলোচনায় আমাদের ক্ষেত্র গবেষণার উপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল হতে হবে। তবু খন গানের বৈশিষ্ট্য ও গোত্র নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের বক্তব্য নিচে একবার দেখে নেওয়া যাক—

লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সচিব শ্রী মতিলাল কিস্কু খনগান সম্পর্কে বলেন-—

"আমাদের রাজ্যের ব্যাপ্ত লোক আঙ্গিকের ধারার যে বহমান আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাতে খন একটি বিশিষ্ট্য লোকনাট্য ধারা।"[১১]

একই গ্রন্থে স্থানীয় গবেষক ধনঞ্জয় রায়ও একই রকম বক্তব্য প্রকাশ করেছেন প্রসঙ্গ কথায় —

এই ভাবে —"দিনাজপুর জেলার একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য খনগান"।[১২]

স্থানীয় বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক সমিত ঘোষ মহাশয় খন গানের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন — "যে লোক নাটককে নিয়ে দক্ষিন দিনাজপুরের মানুষ গর্ব করতে পারে সেটি হল 'খন গান'।[১৩]

একটি দৈনিক সংবাদপত্র ছবি সহ সংবাদ প্রকাশ করে খন গান সম্পর্কে লিখেছে—"দক্ষিন দিনাজপুর জেলার খন গান বিখ্যাত খনেরই আর একটি রূপ 'মিনতি সরী'। লক্ষ্মী পূজার পরের তিনদিন ধরে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ এই পালাগান করে বাড়ি বাড়ি অর্থ সংগ্রহ করে।"[১৪]
'ছুট খন' — তথ্যের খাতিরে বলে রাখা ভালো 'মিনতিসরী' খন গানের কোনও বিশেষ আঙ্গিক নয়, — কেবলমাত্র একটি পালার নাম। 'ঢাকোশ্বরী', 'চাকাইশ্বরী' প্রভৃতি এরকম একাধিক খন গানের পালা বর্তমান।

'কুশমন্ডী গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি'- নামক খন গানের দল পরিচালক শ্রী খুশি সরকার আমাদের কাছে এক দীর্ঘ আলোচনায় খন গানকে তার মতো করে বলেছেন—

"খন গান গ্রাম্য জীবনের কেচ্ছা কাহিনীর গান হিসাবে শুরু হলেও বর্তমানে তাঁর রুচিশীলতায় যথেষ্ট পরিবর্তন লাভ করেছে।"[১৫]

গবেষক শ্রী শ্রী হর্ষ মল্লিক আবার খন গান সম্পর্কে যা বলেছেন— তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন—

"উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট পালা রূপে এই নাট্যপ্রকার প্রচারিত হয়। পল্লীর সাময়িক ঘটনা এর প্রধান অবলম্বন। গীতিপ্রধান এই নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার সংলাপ ব্যবহৃত হয়।"[১৬]

একই গ্রন্থের অন্য স্থানে আবার খন গানের বিশেষ গবেষক ড. শিশির মজুমদার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেছেন—

'খন্' অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার লোকসমাজের অতি প্রিয় এক নাট্য রূপ। লোক সমাজের ভাষায় 'খন্' গাউন। 'খন্' শব্দটি জলপাইগুড়ি অঞ্চলে 'ক্ষেত' অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু সেখানে 'খনগাউন' অপ্রচলিত ও অপিরিচিত। 'পটুয়া' গানের পালায় 'খন্ড' কথাটি পাওয়া যায়। 'খন্ড' হল ঘটনা। 'খন্ড' যখন গানে বাঁধা পড়ে, তখন তা 'খন'। ভাষা তত্ত্বের নিয়ম অনুসারেও 'খন্ড' থেকে 'খন' হতে পারে।"[১৭]

তাছাড়া তিনি আর একটি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, যা পালাকার, গায়ক ও দল পরিচালক খুশি সরকার বয়ান কে সমর্থন করেছে। তিনি বলেন—

"খন" আবার বিশেষ অর্থ পায়। দেশী পলি অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের কাছে এর অর্থ— কলঙ্ক জনিত সত্য ঘটনা"[১৮]

সুনীল চন্দ মহাশয় তাঁর 'দিনাজপুর কথা' নামক একটি ছোট গ্রন্থে লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের জানাচ্ছেন—

"দুই দিনাজপুরের উল্লেখযোগ্য পালাগান খন। .... খন দু'ধরণের। শাস্তরী ও খিসা। শাস্তরী- অর্থাৎ শাস্ত্র বিষয়ক। আর খিসা সত্য ও লোকমুখে চর্চিত ঘটনার আধারে রচিত গান। যার বেশীরভাগই পরকীয়া প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে"।[১৯]

আবার উত্তর দিনাজপুর জেলার আর এক গবেষক বৃন্দাবন ঘোষ "উত্তর দিণাজপুরের 'খন' সমীক্ষা-১" প্রবন্ধে বলেছেন

" 'খন' এই জেলায় গান বলেই পরিচিত। এই জেলার বিভিন্ন সময়ের ঘটে যাওয়া গোপন প্রণয়, অসবর্ণ বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি বিষয়কে মুখে মুখে এই নাটক তৈরী হয়। কখনো একজন, কখনো বা একাধিক মানুষ মিলে এসব পালা গঠন করে থাকে।

পালার সংলাপগুলি আঞ্চলিক ভাষার। পালার সঙ্গে সংগতি রেখে গান রচিত হয়। খন পালাগুলি সংগীত প্রধান। তাই অনেকে খনকে লোকনাট্য না বলে গান বলে থাকেন।"[২০]

অন্যদিকে 'উত্তরবঙ্গের লোকগান' গ্রন্থে 'দিনাজপুরের খন গানঃ সৃজন ও নির্মাণ' প্রবন্ধে খন গান সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় আরও মন্তব্য করেছেন এভাবে—

"মূলত দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর... এই দুটি জেলার লোকনাট্যের মধ্যে খন প্রধান আদর্শ। খন-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিজ্ঞান হল লিঙ্ক বিটুইন লাইফ এন্ড থিয়েটার অর্থাৎ লোকায়ত মানুষের আত্মভোলা সারল্য এবং উজ্জীবন শিল্পময় রূপায়নে নির্মিত লোকনাটক।"[২১]

আবার অন্যদিকে ধনঞ্জয় রায়ের এই প্রবন্ধের শুরুতে শ্রী রতন বিশ্বাস মহাশয় খনগান নিয়ে মুখবন্ধ লিখেছেন কিছুটা। তাঁতে শ্রী বিশ্বাস সেখানে খুব সংক্ষিপ্ত এবং যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন এভাবে —

" 'খন' লোকগান। দুই দিনাজপুর ও মালদহ জেলায় এই লোকগানের অধিক প্রচলন। 'খন' মূলত লোকনাট্য রূপে পরিচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লোকনাট্য অতিক্রম করে সাধারণভাবে গীত হয়।"[২২]

এবং আর্য্য চৌধুরীর মতে— "গ্রামীণ লোকায়ত নৃত্যগীতিনাট্য 'খন'। [২৩]
অনিল সিংহ — মূলত গ্রামের কেচ্ছা কাহিনী নিয়ে ঘটে যাওয়া বিষয়ে আধারে রচিত খনগানটি"

খনগান ঃ আসর ও সময়ের নির্দিষ্টতা

এই গান সাধারণত "শ্রাবণ মাসের শেষ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত অবসর যাপনের জন্য স্থানীয় কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে পালা রচিত হয়ে থাকে।"[২৪]

আবার খন গানের চিত্র পরিচালক অনিল সিং মহাশয় আমাদের কাছে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানান — "খন গান অঘ্রাণ, পৌষ মাঘ এবং ফাল্গুন মাস পর্যন্ত এই গান চলত এই এলাকার বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম হিসাবে। সাধারণত নবান্নের পরপরই শুরু হত এই খন গান।"[২৫] কুশমণ্ডী গ্রামীন লোকসংস্কৃতি'র সম্পাদক শ্রী খগেন্দ্রনাথ সরকারের মতে "খনগান সারা বছরই চলতে থাকে। সমাজে যখনই কোন মুখরোচক কেচ্ছাকাহিনীর ঘটনা শোনা যায় তখনই স্থানীয় কিছু উৎসাহী ব্যক্তি সেই বিষয়টিকে নিয়ে পালা রচনা করে নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশিত করেন। ফলে খনগানের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। —এর অনুষ্ঠান সারা বছরই।"[২৫ক]

আবার সুনীল চন্দ মহাশয় জানাচ্ছেন - "খেতের পাঁকা ধান ঘরে উঠলেই শুরু হবে রাজবংশীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব 'নবান্ন'। নবান্ন উপলক্ষে খনগানে মেতে উঠবে দিনাজপুর। ... এইভাবে তা চলবে বর্ষকাল পর্যন্ত।"[২৬]

তবে আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষায় বিভিন্ন পালাকার এবং দল পরিচালকদের কাছ থেকে যা জানতে পেরেছি এবং বিভিন্ন পালার ঘটনাকে নিয়ে আমাদের তাৎপর্য এই বলে যে খনগান কোন সময় নির্দিষ্ট লোকনাট্য নয়। এর অনুষ্ঠান গোটা বছর কম বেশী চলতেই থাকে। তবে পাকা ফসল ঘরে উঠে আসার পর কিছুকাল অবসরের সুযোগে খনগানের আসরের পাল্লা পড়ে যায়। অর্থাৎ নবান্ন পরর্বতী কয়েকমাস খনগানের আধিক্য থাকে। তাই অনেকের ধারণা, খনগানের অনুষ্ঠান নবান্নের সময় হয়ে থাকে।

গৌড়বঙ্গের প্রধান প্রধান লোক নাট্যের মধ্যে আমাদের এ পর্বের আলোচ্য 'খন' গান এর আসর অন্যান্য লোকনাট্যের আসরের মত মুটামুটি একই। মঞ্চের চারিদিক খোলা। মঞ্চও সাধারণত মাটির। অর্থাৎ মাঝখানে নাচ-গান-অভিনয় করার মত যথেষ্ট জায়গা ফাঁকা রেখে তার চারিপাশে খন গানের কলাকুশলী এবং বাদ্যযন্ত্রীরা বসেন বৃত্তাকারে। সমতল ভূমিতে অবস্থিত এই মঞ্চে শতরঞ্জি

অথবা খেজুর পাঁটি বিছিয়ে দেওয়া হয় কখনো কখনো। অভিনয় কারি কলাকুশলিরা মঞ্চের প্রথম সারিতে অবস্থান করে তাদের অভিনয়ে অংশ গ্রহণের সুবিধার জন্য। দ্বিতীয় সারিতে বসেন বাদ্যযন্ত্রীরা।

মঞ্চের প্রথম ও দ্বিতীয় সারি বাদ দিয়ে বাকি সকলে দর্শক ও শ্রোতা। যাদের বয়স ছয় থেকে ছিয়ানব্বই যে কেউ হতে পারে। নারী-পুরুষের আলাদা বসার স্থান নির্দিষ্ট থাকলেও তেমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষই এর দর্শক ও শ্রোতা হলেও স্থানীয়রা, দেশী পলিরাই এর আকর্ষক ও পৃষ্ঠপোষক।

খনগানের আসর ও মঞ্চ সম্পর্কে ধনঞ্জয় রায় যথার্থই বলেছেন যে— "মঞ্চ বলতে সাধারণত তিনদিক ঢাকা এবং একদিক খোলা হয়। কিন্তু খন গানের জন্য মঞ্চটি ঠিক সেই রকম নয়। নাটকের কুশিলব, বাদ্য বাদকবৃন্দ এবং দর্শক বা শ্রোতা একই সমতলে অবস্থান করে। মঞ্চটি হয় চারিদিক খোলা—বৃত্তাকার। বৃত্তের মাঝখানে কেন্দ্রস্তলে কুশিলব ও বাদ্যযন্ত্রবাদক শিল্পীরা বসেন।"[২৭] আমাদের ক্ষেত্র গবেষণায় ও আমরা এরকমই লক্ষ্য করেছি।

গ্রামের রাস্তার ধারে, মেলায়, গ্রাম-ঠাকুরের বারোয়ারি তলায় অথবা গৃহস্থ বাড়ির খোলানে খন গানের আসর বসে। ইদানীং শহরে বইমেলা, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে, দূর্গাপূজা, কালিপূজা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানে মঞ্চ করে এই গান অনুষ্ঠিত হয়।

খনগানের আসর বা মঞ্চ নিয়ে শিশির মজুমদারও মুটামুটি একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি কি বলেছেন একবার দেখে নেওয়া যাক— "কুশীলব (গাইন), বাদ্যযন্ত্রী (বাইন), দর্শক ও পৃষ্ঠপোষক এই নিয়ে হলো আসর। খন-এর মঞ্চ নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। সমস্ত খাঁটি লোকনাট্যের মঞ্চের যা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বত্তঙ্কার, খন-এও তাই। বৃত্তাকার মঞ্চের মধ্যস্থলে বাদ্যযন্ত্রী কুশীলবের অবস্থান।"[২৮]

এ সম্পর্কে বৃন্দাবন ঘোষ খুব ছোট করে বলেছেন—

"গ্রামাঞ্চলের মুক্তাঙ্গণে দর্শক পরিবেষ্টিত স্থানে— খন গান অনুষ্ঠিত হয়।"[২৯]

মঞ্চ বা আসর বিষয়ে ক্ষেত্র গবেষণায় আমরা যা দেখেছি তা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি পূর্ববর্তী বক্তাদের মতামত ভুল না হলেও বর্তমানে আধুনিকতার কিছু ছোঁয়া কিন্তু লেগেছে খন গানের মঞ্চাসরে। অর্থাৎ কিছু কিছু সময়ে খন গানের দলগুলি সমতলের মঞ্চ ছেড়ে বাস কাঠ দিয়ে দর্শকাসনের থেকে একটু উঁচুতে অভিনয় করতেই পছন্দ করছেন। তাছাড়া আগে যেখানে

মশাল কিম্বা হ্যাচ্ছাক্ জ্বালিয়ে সারা রাত্রি জেগে অনুষ্ঠান হত এখন আর তেমন হয় না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সেখানে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে গানের আসর বসছে। যেখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেই সেখানে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সময়ের ব্যাপ্তিও কমেছে।

তবে আসর সাধারণ স্কুল মাঠ, বারোয়ারি মন্ডপের মাঠ, স্থানীয় কোন ব্যক্তির বৃহৎ উঠোন, ক্লাবের মাঠ, কিম্বা ফসল উঠে যাওয়া শূন্য ক্ষেতে এই গানের আসর বসে উপরে সামিয়ানা খাটিয়ে; যাতে শিশিরের হাত থেকে বক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া নিচে খড়, বিছালি জাতীয় কোন বস্তু বিছিয়ে বসার উপযুক্ত করা হয়। গরমকালে উপরে সামিয়ানা থাকে না।

সাধারণত কলাকুশলিরা আগে থেকেই সাজগোজ মেকাপ পরে আসরে বসে থাকে। আবার কখনো কখনো মঞ্চের আশে পাশে কাছাকাছি কোন বাড়ির বারান্দায় বা কাপড়ের ঘেরায় গ্রীণ রুমের কাজ চালিয়ে নেয়। সাজ পোশাকের তেমন কোন বালাই না থাকলেও মহাজন বা জ্যোৎদারের পোশাক ভূমিহীন কৃষকের চেয়ে ভালো হওয়া চাই।

তাছাড়া আগে যেখানে সন্ধ্যা থেকে সারা রাত্রি ব্যাপি খন গানের আসর চলত এখন তার ব্যপ্তি কমে গিয়ে মাত্র ২ থেকে ৩ ঘন্টা অনুষ্ঠান চলে। আগের মত সৃষ্টিশীল রচয়িতারও অভাব রয়েছে যথেষ্ট। তবে এখন যারা এই খন গানের সঙ্গে যুক্ত তারা অধিকাংশই বিভিন্ন সরকারি প্রচারের জন্য নির্ধারিত পালা রচনা করছেন। নচেৎ পুরনো জনপ্রিয় কাহিনিগুলি নিয়ে নিজের মত করে অনুষ্ঠান করছেন। ফলে সমাজে খনের চাহিদা দিন দিন কমছে।

খনগান ঃ পর্ব থেকে পর্বান্তরে

গম্ভীরা সহ অন্যান্য লোক নাট্যে পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাওয়ার জন্য যেমন কয়েকটি ধাপ রয়েছে, তেমনি আমাদের এ পর্বের আলোচ্য লোকনাট্য ‘খন’ গানেও বেশ কয়েকটি ধাপ বা পর্ব বিন্যাস রয়েছে। তবে বর্তমানে এই পর্ব বিন্যাসগুলি আর তেমন ভাবে দেখা না গেলেও অন্তত কয়েকটি বিষয় এখনও চোখে পড়ে। যথাস্থানে তা আলোচনা আমরা করব। পূর্বে ‘খন’ গানের যে

পর্ব বিভাগ গুলি ছিল সে গুলি এবার আলোচনা করে দেখে নেওয়া যাক।

'খন' গান মূলত দুই প্রকার। ১) শাস্তরী খন ২) খিসা খন।

লেখ চিত্রের মাধ্যমে এই পর্বটিকে আমরা একবার দেখে নিই।

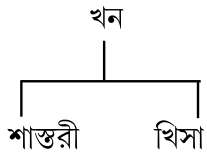

শাস্তরী অর্থে ধর্ম কেন্দ্রিক। শাস্ত্র অনুমতে বিভিন্ন ধর্মীয় এবং পৌরাণিক ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে যে নাট্য কাহিনি তৈরি হয় এবং অভিনিত হয় তাকে শাস্তরী খন বলে। আর সাধারণত পাড়ার কেচ্ছা কাহিনি অবলম্বনে মুখরোচক ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে যে নাট্য কাহিনি পরিবেশিত হয় তাকে খিসা খন বলে।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমরা জেনে নিতে পারি— "দুই দিনাজপুরের উল্লেখযোগ্য পালাগান খন। খন দু ধরণের। শাস্তরী ও খিসা। শাস্তরী অর্থাৎ শাস্ত্র বিষয়ক। আর খিসা সত্য ঘটনা ও লোকমুখে চর্চিত ঘটনার আধারে রচিত গান। যার বেশিরভাগই পরকীয়া প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে।"[৩০]

গবেষক শিশির মজুমদার এই দুই শ্রেণির খন সম্পর্কে বলেছেন—

" 'খন'-এর পালাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক - খিসা, দুই - শাস্তোরী।"[৩১]

'খিসা' শব্দটি বোধ করি ফরাসী কিসসা বা কেচ্ছা থেকে এসেছে। সমাজ অস্বীকৃত অবৈধ প্রণয় বা যে কোন কলঙ্ক জনক 'খন্ড'ই 'খিসা'। এ ধরণের খণগুলো শুধুমাত্র 'খিসা' নামেও পরিচিত, প্রচলিত।

'শাস্তোরী'—শব্দটির উৎস শাস্ত্রীয়। কোন একটি ঘটনা অবলম্বনে শাস্ত্রীয়তর্ক আলোচনা এর প্রধান বিষয়। এ ধরনের গানগুলো শুধুমাত্র 'শাস্তোরী' নামেও খ্যাত।"[৩২]

দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি গবেষক ধনঞ্জয় রায় খন গানের এই দুই শ্রেণি সম্পর্কে বলেছেন—

"এই নাটকগুলি মূলত সমাজজীবন নির্ভর কাহিনি ভিত্তিক। শাস্ত্রীয় বিভিন্ন শ্লোক কাহিনিতে প্রভাব বিস্তার করে।"[৩৩]

অর্থাৎ শাস্ত্রীয় মোড়কে কাহিনির মূল কাঠামো তৈরি হয়ে থাকে। শাস্তোরী খন-এ। আর শাস্ত্র বহির্ভূত সমাজের অন্য বিষয়গুলির ভালো মন্দ এসব নিয়ে খিসা খন তা বলা বাহুল্য।

এছাড়া খন গানের চিত্র পরিচালক অনিল সিং, পালাকার খুশি সরকার এবং নিমাই সরকার সহ প্রায় ৩০ জন অভিজ্ঞ শিল্পী আমাদের নিজস্ব সাক্ষাৎকারে মুটামুটি একই মত ব্যক্ত করেছেন।

তবে আমরা আমাদের ক্ষেত্র গবেষণা লক্ষ্য করেছি খিসা খন এবং শাস্তোরী খন বাদে তার ব্যাপ্তি আরও বেড়ে গেছে অনেকখানি। কেননা "সমাজের বিভিন্ন ঘটনা থেকে খন পালাগানের বিষয় নির্বাচন করা হয়। গানের বিষয় বস্তুর মধ্যে যেমন আছে জোতদার জমিদারের শাসন ও শোষণের কথা, তেমনি সুদের কারবারের দ্বারা জমি বাড়ানোর কৌশল, সমাজের রঙ্গ ব্যঙ্গের বিষয়, হাসি-ঠাট্টা, দুঃখ-বেদনা, বৈধ-অবৈধ প্রেমের কেচ্ছা, ক্ষুধা ক্রোধ ভীতি যৌন প্রেরণা, প্রণয়। কৃষক ও কৃষক রমণীর জীবনগাথা, গ্রাম্য সমাজের গুরুদের নষ্টামি, প্রেম ভালোবাসা, আচার-আচরণ, নিরক্ষরতার যন্ত্রণা, সামাজিক অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ। পঞ্চায়েত প্রধান বিডিও এম.এল.এ এবং মন্ত্রীদের ন্যায়-অন্যায় ও দুর্নীতির ঘটনা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য সচেতনতাবোধ, পরিবেশ দূষণ, প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম, বান-বন্যায় দুরবস্থার কথা, খরার তীব্রতায় হাহাকার, তেভাগা আন্দোলনে পুলিশের নির্যাতন, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় ইত্যাদি সামাজিক ঘটনার সাবেক ও বর্তমান অবস্থার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটে খনগানের বিষয় নির্বাচনে।"[৩৪]

ইদানিং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচারাভিযানে বিষয় ভিত্তিক পালা রচিত হয়ে জনগণের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। তাই বলতেই হয় বর্তমানে 'খন গান' খিসা এবং শাস্তরী-র ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহত্তর পরিসরে এগিয়ে গেছে।

বিভাগ/উপবিভাগ

পৃথিবীর তামাম লোকনাট্যের মত খন গানেও (আসলে এক প্রকার লোকনাট্য) কয়েকটি বিভাগ এবং উপবিভাগ রয়েছে। যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি পর্বে/উপবিভাগে গাওয়া হয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে ঐ সমস্ত উপবিভাগের লক্ষণ গুলি তেমন আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবুও কিছু কিছু উপবিভাগ এখনও পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের আলোচ্য লোকনাট্যগুলির প্রত্যেকটি লোক নাট্যেরই কতকগুলি উপবিভাগ আছে। বলা যেতে পারে পর্ব থেকে পর্বান্তরের মাধ্যমে প্রতিটি লোকনাট্যের অনুষ্ঠান যেভাবে সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছায় আমাদের এ পর্বের আলোচ্য 'খনগান'ও ব্যতিক্রমী কিছু লোক নাট্য নয়, ফলে খন গানে যে নির্দিষ্ট কতগুলি উপ বিভাগ আছে তা এবার আমরা দেখে নিতে পারি—

খোলবন চাপড়ানো > আসর বন্দনা > নাচারি > পালাগান।

লেখচিত্রের মাধ্যমে খন-এর উপবিভাগগুলি এরকম—

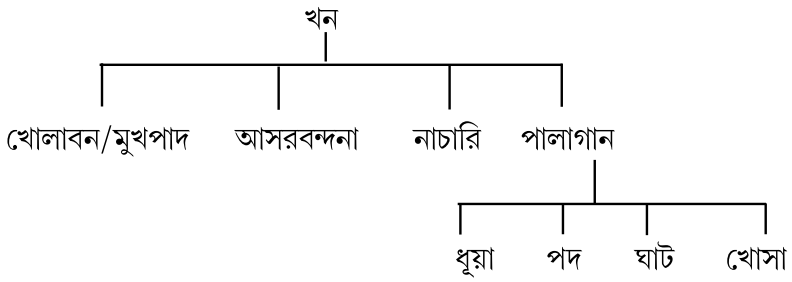

খোলাবন

সংগত/যন্ত্রসংগত অথবা খোলাবন অর্থে Concert। এই পর্বে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র এক যোগে বাজানো হয় পনের কুড়ি অথবা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত। সাধারণত মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে এই পর্বটি থাকে। এক যোগে যন্ত্র সঙ্গীত গুলি বাজানোর অর্থ হল আশপাশ অঞ্চলের সকলকে জানান দেওয়া যে; মূল অনুষ্ঠান কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। এই সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের আগেই আরও একটি ক্ষুদ্র অংশ আছে। এই সময় বিভিন্ন খন্ডের বিক্ষিপ্তভাবে টুং-টাং শব্দ হতে থাকে। অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র অংশে যন্ত্রগুলির টুং-টাং আওয়াজের মাধ্যমে সকলের যন্ত্র সমবেত বাজানোর উপযুক্ত করে সুর বেঁধে/লয় করে নেওয়া হয়।

ধনঞ্জয় রায় এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন — "খোলাবন চাপড়ানো বা Concert দিয়ে এই গানের আসর শুরু হয়।"[৩৫]

আসর বন্দনা

"পালার প্রস্তুতি পর্বে 'খোলাবন চাপড়ানো' বা Concert বাজান বাদ্যযন্ত্রীরা। এরপর যথারীতি আসর-বন্ধনা শুরু হয় এবং বন্দনার পরে মূল পালাগান আরম্ভ হয়।"[৩৬]

উপরের বক্তব্য থেকে থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে, Concert শেষ হলে শুরু হয় আসর বন্দনা। এই পর্বে উত্তর-দক্ষিন, পূর্ব-পশ্চিম সহ শিব-দূর্গা, পীর সহ গঙ্গাদেবীর বন্দনার সাথে সাথে আসরে উপস্থিত দশজনার বন্দনা করেন কলাকুশলিরা। এছাড়া যদি কোন দেবদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে গানের আসর বসে সেই দেবীর বন্দনাও করা হয়। আর আসর বন্দনার সময়ই জানিয়ে দেওয়া হয় সেদিনের আসরে কোন পালাটি গাওয়া হবে বা অভিনীত হবে। এই বন্দনা গানের নমুনা দেওয়া হলো—বৃন্দাবন ঘোষের লেখা থেকে—

" পূর্বে বন্দনা করি ধর্ম ঠাকুরের চরণ,
উত্তরে বন্দনা করি কালি মায়ের চরণ।
পশ্চিমে বন্দনা করি পীর বাবার চরণ,
দক্ষিণে গঙ্গা মায়ের চরণ।"[৩৭]

এইভাবে— পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং শ্রোতা-দর্শক ও মান্য ব্যক্তিদের বন্দনা করে অনুষ্ঠিত খন পালার নামটি উল্লেখ করে বন্দনা অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বন্দনা গানের শেষে বলা হয়—

"বন্দনা সমাপন হইল শুনেন দশজন।
এই আসরে গাইম হামরা বর্মোশোরী খন।"[৩৮]

বলা বাহুল্য 'বর্মোশ্বরী' পালা গাওয়ার কথা বলা হয়েছি।

Concert এর সময় থেকেই ধীরে ধীরে আসর জমতে থাকে। বন্দনা গানের সময় পর্যন্ত যথেষ্ট মানুষের ভীড় হলেও মূল পালা অভিনিত হওয়ার সময়ই সবথেকে বেশি জন সমাগম হয়। এই গান উপলক্ষে জনসমাগম ও ভীড়ের জন্য এলাকাটি অনেকসময় ছোট খাটো মেলার আকার ধারণ করে।

পালাগান

বন্দনা গান শেষ হলেই শুরু হয় মূল পালাগান। কখনো কখনো এই পালাগানেরই অংশবিশেষ ছোকরা নাচ বা দুকরী নাচ দিয়েই পালারাম্ভ হয়। সাধারণত কিশোর বয়সের ছোকরা দিয়ে এই পর্বের কাজ চালানো হলেও অনেকসময় উপযুক্ত কিশোরের অভাবে ২২/২৫ বছরের হাল্কা পাতলা যুবক দিয়েও এই কাজ চালিয়ে দেওয়া হয়। - এই অংশের নাম 'নাচারি'।

এই পালাগানকে নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। অংশ গুলি—ধুয়া, পদ, ঘাট এবং খোসা।

ধুয়া অর্থ গানের এক পংক্তি শেষে যে অংশটি সমবেত ভাবে অন্য কলা-কুশলীরা বার বার গেয়ে থাকেন। স্থানীয় ভাষায় এদের 'দোয়ার' বলে। দোহার > দোয়ার।

পদ অর্থ চরণ। মূল গায়ক এই অংশে কবিতার আকারে অনেক সময় ছড়া বলে থাকেন এবং সেই কবিতার ব্যাখ্যাও দেন। প্রত্যুৎপন্নি এই কবিতা সকলকে মুগ্ধ করে। ভালো ছড়াকার তার নিজগুনে এবং ব্যাখ্যার মাধুর্যে খ্যাতির শির্ষে পৌঁছাতে পারেন কেবলমাত্র এই অংশটির জন্য। পরবর্তীকালে এই পদগুলি শ্রোতার মুখে মুখে প্রচার লাভ করে অমরত্ব লাভ করতেও পারে। তবে পালার কোন লিখিত রূপ থাকে না।

ঘাট অর্থ অভিনয় পর্ব। এই পর্বে অভিনয় শুরু হয় মূল পালার। পালাগুলি ঢাকোশ্বোরী, বর্মোশ্বোরী, গবানু বাউদিয়া প্রভৃতি যাই হোক না কেন এই অংশে প্রয়োজনীয় সকল কলা কুশলী অংশ নেন অভিনয়ে। এবং খোসা অর্থাৎ "দর্শক বা শ্রোতাদের কাছে পালার গান যেন এক ঘেয়েমি বা ক্লান্তি কর না হয় তার জন্য খোসা দেওয়া হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক কাহিনি ও বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'রসিয়া' খোসা পরিবেশ করে।"[৩৯] খোসা অর্থে রঙ্গ রসিকতা।

খনগান ঃ কলাকুশলীর আত্মার আত্মীয়

খন গানে কলাকুশলী বলতে প্রথমেই বলতে হয় দল প্রধানের কথা। গম্ভীরা, আলকাপ, বা কবি গানে দল প্রধানকে যেমন বলা হয় সরকার, ম্যানেজার বা খলিপা তেমনি খন গানের দলের প্রধানকে বলা হয় 'মাখি'। ইদানীং অবশ্য ম্যানেজারও বলা হচ্ছে। মাখি-ই দল পরিচালনা, গান রচনা, অভিনয় করা, বায়না ধরা সব কিছুর প্রধান। কখনো কখনো তারা সরাসরি অভিনয়ে অংশগ্রহণও করে। দলে মাখির প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি। দলের সুনাম তার উপরই নির্ভরশীল।

মাখির পর দলে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় 'মুড়ি' এবং 'নাহিড়ী' অর্থাৎ নায়ক-নায়িকা। স্থানীয় ভাষায় মুড়ি অর্থে নায়ক, নাহিড়ী অর্থে নায়িকা। খিসা খন বা শাস্তোরী খন দুইপ্রকার খনেই মুড়ি-নাহিড়ীর বিশেষ প্রয়োজন। তাদের বোঝা পড়া এবং অভিনয়ের গুনেই দর্শক আপ্লুত হয়। তাদের যথার্থ অভিনয়ে দলের সুনাম এনে দিলে উক্ত দলটি অধিক পরিমান অনুষ্ঠানের সুযোগ পায়। ফলে ইনকামের যথেষ্ঠ ব্যবস্থা হতে পারে। এই কারনে দর্শক শ্রোতা উভয়ের কাছেই এরা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে থাকে।

এর পরের স্থান অবশ্যই 'ওসিয়া'-র। এরা সাধারণত জিঙ্ক অক্সাইড পাউডার মেখে মুখ সাদা করে মঞ্চে বসে থাকে এবং কখনো কখনো অভিনয়ে অংশগ্রহন করে। সাধারণত সহজ শব্দের বিক্রিত উচ্চারণ অথবা টনটিং এর মাধ্যমে দর্শক শ্রোতার মনরঞ্জন করে থাকেন। এদের অভিনয়ের পর্বটিকে বলা হয় 'খোসা'। খোসা অর্থে— খুশি বা খোস করে যে।

"দর্শক বা শ্রোতাদের কাছে পালার গান যেন এক ঘেয়েমি অথবা ক্লান্তিকর না হয় তার জন্য 'খোসা' দেওয়া হয় অর্থাৎ পর্বভিন্ন সামাজিক বিষয় ও কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রসিয়া খোসা পরিবেশন করে।"[৪০]

ওসিয়া সম্পর্কে ধনঞ্জয় রায়ের বক্তব্যটি একবার দেখে নেওয়া যাক—

"ছোকরা, ছুকরি বা বাঈ খনগানে এদের গুরুত্ব অপরিসীম এরা আসলে পুরুষ, মেয়ে সেজে নাচে। নাচার জন্য কেউ কেউ মাথায় স্বাভাবিক চুল রাখে আবার কেউ কেউ পরচুলাও পরে। পরণে এদের মেয়েদের মতো শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ এবং ব্লাউজের নীচে পাতলা কাপড়ের টুকরো গোল করে দলা পাকিয়ে অথবা তুলোর প্যাড দিয়ে নারীর স্তন বোঝাবার জন্য বুক-বন্ধনী

ব্যবহার করে। হাতে বিভিন্ন রঙের কাঁচের চুড়ি। গলায় রোল গোল্ডের হার অথবা পুঁতির মালা, কানে দুল, নাকে নাকছাবি এবং মাথার চুলে লাল সাদা ফিতে বাঁধা। মুখের মেকাপ চড়া রঙে সাদা, গালে লাল রঙের আভা, ঠোঁটে ডগডগে লাল এবং আধুনিক নারীর মতো শাড়ি পরে।"[৪১]

এরপর পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনীয় চরিত্র গুলির অবস্থান না পেলেও "ভিলেন'-এর চরিত্রের গুরুত্বও আছে। খ্যাতিমান ভিলেন মানুষের মনরঞ্জন করে, ফলে তার গুরুত্বও কম নয়।

এছাড়া স্থানীয় ভাষায় ভাঁড়কে 'প্যাংচিয়া', জোকারকে—ধাপতিয়া, নৃত্যগান পটু ছোকরা বা ছুকরীকে 'গীদাল' বলে।

আসলে প্রতিটি পালাতেই এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এরা অনেকটাই সূত্র ধরে কাজ করে মানুষকে হাসায়। অনেকসময় আবার মূল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশ্রাম দেবার জন্য এরা আসরে নেমে গুরুগম্ভীর পরিবেশকে হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে যেমন হাল্কা করে তোলে তেমনি বিদ্রুপ এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গর মাধ্যমে সমাজের ন্যায় অন্যায়কে তীব্র কষাঘাত করে। সহজভাবে বলা তার এই কষাঘাত তখন ভিন্ন মাত্রা পায়। এখানেই এই চরিত্রটির সার্থকতা লাভ করে।

এছাড়াও কলাকুশলিদের সহযোগিতা করার জন্য মঞ্চের চারপাশে বসে থাকা, যন্ত্র বাদকদের মধ্যে ডুগি-তবলা, বাঁশি, কাশি, ঝুমুর, জুড়ি, ক্যাসিও, হারমনিয়াম, ড্রামপেড প্রভৃতি ধরনের বাদ্যকারগন অংশ গ্রহণ করে থাকে।

সর্বোপরি খনগানের আয়োজক এবং দর্শকরাই এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তোলে। অনুষ্ঠানে দেশি-পলি, হিন্দু-মুসলিম, সাঁওতাল, ব্রাহ্মন, নমঃশূদ্র সকলেই অংশগ্রহণ করে সমবেত ভাবে। ফলে এই গানে সকল ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে। ফলে খন গান হয়ে ওঠে আরও আকর্ষনীয় ও চমৎকার। আয়োজকদের মধ্যে ক্লাব, সরকারী দপ্তর বা স্থানীয় কোন সম্ভ্রান্ত লোক এই গানের আয়োজন করে থাকেন।

খনগান ঃ গানের বৈশিষ্ট্য

"....খন .... সমস্ত খাঁটি লোক নাট্যের বৈশিষ্ট্য যুক্ত।"[৪২]

বলা বাহুল্য অন্যান্য লোক নাট্যের সাধারণত যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন আমাদের এ অধ্যায়ের আলোচ্য খন গ্রাম ও তার ব্যতিক্রমী নয়। তবু গম্ভীরা, আলকাপ, ডোমনির সঙ্গে অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্যই আছে। নিচে বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনার সময় অবশ্য সে গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব আমরা। এবার দেখে নেওয়া যাক— খন গানের বৈশিষ্ট্য গুলি—

খনগান ঃ বিশেষ বৈশিষ্ট্য

১) অন্যান্য লোকনাট্যের মত খন গানের পালার কোনও লিখিত রূপ থাকে না। তবে ইদানিং খগেন্দ্রনাথ সরকার, সৌরভ রায়, নিমাই সরকার প্রভৃতি কয়েকজন লিখিত আকারে পালাগান তৈরি করছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র গানগুলির লিখিত রূপ থাকে।

২) গম্ভীরার মত সুক্ষ্ম বিষয় খনগানের খুব কম পরিবেশিত হয়। বরং সুক্ষ্মতার পরিবর্তে স্থুলতা, ভাড়াঁমো এবং কলঙ্কজনিত ঘটনার পরিবেশন চোখে পড়ে।

৩) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমতল জমি বা বাড়ির ওঠোনকেই মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা হলেও বিভিন্ন রকম সরকারি প্রচার, বড় ধরনের কোন অনুষ্ঠান হলে বাঁধানো মঞ্চে খনের আসর বসে।

৪) খন গানের লোকশিল্পীদের পোশাকের উপর তেমন কোন বাধ্য বাধকতা থাকে না। যেহেতু গ্রামের সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পালা গানের আসর বসে তাই পোশাকের বাহুল্য থাকে না।

৫) অভিনেতা অভিনেত্রীরা সাঁজ ঘরে ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ তারা প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় সাজ পোশাক পরে থাকেন।

৬) গম্ভীরার মত বাড়ি বাড়ি গিয়েও ছোট ছোট পালার অভিনয় হয়ে থাকে কখনো কখনো। একে বলে 'ছুট খন'।

৭) সাধারণত মঞ্চের চারিদিকে দর্শক শ্রোতা থাকে বলে অভিনয়ও চারদিক ঘুরে ঘুরে করতে হয়।

৮) খন গানের আয়োজন করে থাকে ধনবান গৃহস্বামী, ক্লাব অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠান। তবে খনগানের দলগুলি কখনো কখনো নিজেদের উদ্যোগেও আসর বসিয়ে থাকে।

৯) আগে গান শুরু হতো রাত্রি সাড়ে ন'টায় এবং প্রায় গোটা রাত্রি ব্যাপি আসর চলত। কিন্তু বর্তমানে দুপুরের পর পর শুরু হয়ে চলে রাত্রি ১০ টা পর্যন্ত। আগে প্রতিযোগিতা হত এখন আর হয় না।

১০) সর্বপরি খন গানের ভাষা একদম আঞ্চলিক দেশী-পলি। অর্থাৎ কামরূপী।

১১) খনগানে এখনও পর্যন্ত কোন মিশ্র সংস্কৃতির বাহুল্য ঘটেনি। ফলে প্রকৃত লোকনাট্যের মর্যাদা তার এখনো আছে।

খনগান ঃ পর্বান্তরের কারণ

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের চাহিদা ও রুচিরও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ফলে সমগ্র মানবজীবনে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিতও হয়েছে। যার ফলস্বরূপ প্রচলিত লোকনাট্য গুলিতেও প্রভাব বিস্তার করেছে সেইসব ঘটনা। গম্ভীরা, আলকাপ, ঝুমুর, ছৌ যেমন তাকে অস্বীকার করতে বা উপেক্ষা করতে পারেনি আমাদেরও পর্বের আলোচ্য খন গানও তেমনি উপেক্ষা করতে পারেনি। ফলে খনগানে অনেকটাই পর্বান্তর ঘটে গেছে। সেই সব পর্বান্তরের কারণগুলি আমরা এবার নিচে দেখে নেব—

১) সময় দ্রুত পরিবর্তন শীল, তাই মানুষকেও তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পরিবর্তীত হতে হচ্ছে। জীবন যাত্রায় তার প্রভাব ফেলেছে। ফলে মানুষের অবসরজীবনও ছোট হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ অভিনয় দেখার বা শোনার মত পর্যাপ্ত সময় এবং রুচি তার নেই, বাধ্য হয়ে পালার আয়তন ছোট করতে হচ্ছে।

২) আগের তুলনায় মানুষের আর্থিক জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটছে। ফলে কৃষিকার্জে যুক্ত প্রতিভাবান শিল্পীরা বাইরে অধিক আয়ের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। যার ফলে 'খন' তার পুরনো ঐতিহ্য হারাচ্ছে।

৩) সামাজিক জীবনে হিন্দী বাংলা সিনেমার প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ার ফলে পালা গানেও

তার ছাপ পড়ছে। এমনকি খন নিয়ে 'চাকাইশ্বরী' নামের টেলিফ্লিমও তৈরি হয়েছে।

৪) খনের দল গুলি পূর্ণমাত্রায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে না উঠলেও কিছু কিছু লোক কেবলমাত্র সরকারী অনুগ্রহ পাবার জন্য দল গঠন করেছে। ফল হিসাবে 'খন' গানের মান কমে যাচ্ছে।

৫) আগে লণ্ঠন বা হ্যাজাক জ্বালিয়ে খনের আসর বসত, কিন্তু বর্তমানে বিদ্যুতের আলোয় খনগান পরিবেশিত হয়।

৬) আশির দশক পর্যন্ত খালি গলায় খনের আসর বসলেও এখন কিন্তু মাইক সহযোগে আসর বসে।

৭) হিন্দী-বাংলা চ্যানেলের মুখরোচক কাহিনী সাধারণত মানুষকে খনগানের আসর থেকে অনেকটাই মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করছে। যার সমাধান এখনও খন শিল্পীরা খুঁজে পাননি।

৮) শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রতিভাবান শিল্পীরা খনগান পরিবেশনে আর তেমন কোন আগ্রহ দেখান না। ফলে প্রতিভাবান রচয়িতা শিল্পী এবং অভিনয়কারীদের অভাবেও খনগান তার ঐতিহ্য হারিয়ে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

খনগান ঃ শিল্পীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা

শিল্পীদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের, প্রায় প্রত্যেকেই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র চাকুরীজীবি তাও অল্প বেতনের। উচ্চ শিক্ষিতরা তেমন আগ্রহ দেখান না সরাসরি নাচ গানে অংশ গ্রহণে। তবুও খনগানের ধারা জনপ্রিয়তায় কিন্তু ভাটা পড়ে নি। বরং এখনও অনুষ্ঠানের কথা জানতে পারলে অল্প সময়ের মধ্যেই জন সমাগম যথেষ্ঠ দেখা যায়।

আমরা আমাদের ক্ষেত্র গবেষণায় ১২৮ জন শিল্পী ও সহশিল্পীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়ে তাদের আর্থিক অবস্থা যা জানতে পেরেছি এবং তাদের শিক্ষার মান সম্পর্কে যা তথ্য পেয়েছি তা নিচে দেওয়া হল—

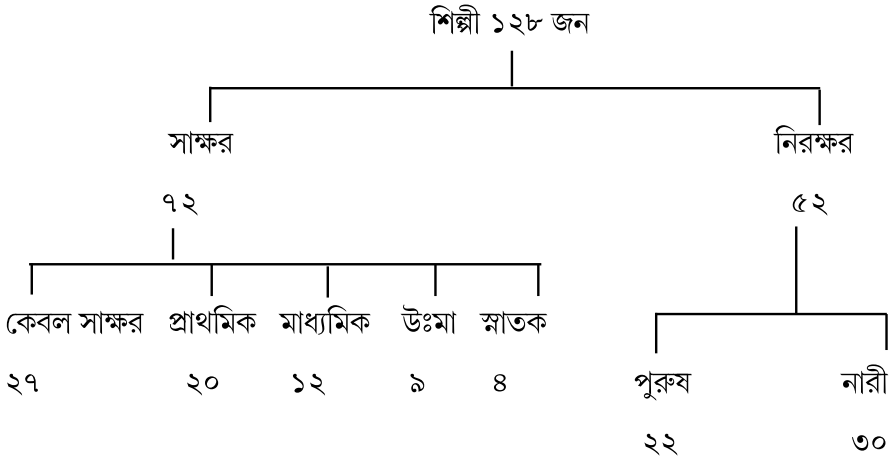

বলা বাহুল্য ৭২ জন স্বাক্ষরের মধ্যে মাত্র ৫ জন মহিলা। বাকি ৬৭ জনই পুরুষ। তাদের মধ্যে একজন অবসর প্রাপ্ত তৃতীয় শ্রেণীর রাজের সরকারের কর্মচারী একজন একটি দৈনিক সংবাদপত্রের অনিয়মিত সাংবাদিক। কেউ কেউ নিচু ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য গৃহ শিক্ষকতা করলেও বাদ বাকি প্রায় সকলেই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও কেউ কেউ ছোট বা ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। (মহিলাদের মধ্যে সকলেই গৃহ চর্যা এবং কৃষিকাজের সঙ্গেই যুক্ত।) আর একজন মাত্র হাইস্কুল শিক্ষক।

খনগানের আয়োজক ও দর্শক

আমরা আগেই বলেছি, খন গানের আয়োজকদের মধ্যে স্থানীয় ভূস্বামী, বা ধনবান ব্যক্তি, ক্লাব বা কোন সামাজিক সংগঠন, কখনো কখনো রাজনৈতিক দল, কিম্বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে খনগানের আসর বসে। পাড়ার সকলে আলোচনার মাধ্যমে চাঁদা তুলেও এই গানের আয়োজন হয়ে থাকে।

দর্শক প্রায় সব শ্রেণীর মানুষ, ধর্ম মত নির্বিশেষে হলেও স্থানীয় দেশী পলি রাজবংশী সম্প্রদায়ের আধিক্য বর্তমান। অবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে এই খন গানের দর্শক ও শ্রোতা।

খনগান ঃ গৌড়বঙ্গের কয়েকটি দল

খন গানের মূল অঞ্চল স্বাধীনতা পূর্ব অবিভক্ত দিনাজপুর এবং রংপুর হলেও স্বাধীনতা উত্তর পর্বে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তরভূক্ত উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার উত্তরাংশে এই গানের জনপ্রিয়তা। মূল গায়েন ও বায়েন ও এই অঞ্চলের। আলকাপ বা অন্য কোন লোক নাট্যের মত বাইরে থেকে কাউকেই হায়ার করে আনতে হয়না। ফলে দলগুলি প্রধানত দুই দিনাজপুর কেন্দ্রিক হলেও উত্তর মালদা জেলার কিছু অংশে গায়েন ও বায়েন লক্ষ্য করা যায়। তবে জেনে রাখা ভালো যে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকেই খন-গানের দল সব চেয়ে বেশি। এবার দেখে নেওয়া যাক খন গানের বিশিষ্ট দলগুলি—

কেবলমাত্র কুশমন্ডি ব্লকেই আমরা ১৫টি দলের সন্ধান পেয়েছি। তাদের বিস্তারিত তালিকা নিচে দেওয়া হল—

দলের নাম	দল প্রধান	ঠিকানা
১) কুশমন্ডি গ্রামীণ লোক সংস্কৃতি	খগেন্দ্রনাথ সরকার	গ্রা. পো- কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর
২) কাকৈর উদীয়মান খন সম্প্রদায়	নিমাই সরকার	কাকৈর কুশমন্ডি, ঐ
৩) উষাভানু	সৌরভ রায়	কুশমন্ডি, ঐ
৪) চৌষা জাগরণী লোকসংস্কৃতি	শুকনাথ সরকার	চৌষা কুশমন্ডি, ঐ
৫) খনগান সংস্থা বাগডুয়া	দীনেশ সরকার	বাগডুয়া, কুশমন্ডি, ঐ
৬) রূপাইন খন সম্প্রদায়	হরেকৃষ্ণ সরকার	রূপাইন কুশমন্ডি, ঐ
৭) হাসাননগর খনগান সংস্থা	নিত্যানন্দ সরকার	হাসাননগর, কুশমন্ডি, ঐ
৮) দূর্গাপুর খন সংস্থা	বানুরাম সরকার	দূর্গাপুর কুশমন্ডি, ঐ
৯) সরলা গীতি খন সংস্থা	দৈত্যরাম সরকার	কুশমন্ডি, ঐ
১০) পলাশ বাড়ি গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি	ঢেকু রায়	পলাশ বাড়ি, কুশমন্ডি, ঐ
১১) খন সংস্থা, পুতহরি	ধীরেন্দ্রনাথ সরকার	পুতহরি, কুশমন্ডি, কঐ
১২) খনগান সংস্থা, মহিষবাথানি	আফুলবালা	মহিষবাথান, কুশমন্ডি, ঐ
১৩) খনগান সংস্থা, মহিষবাথান	টুনু সরকার	মহিষবাথান, কুশমন্ডি, ঐ
১৪) পঞ্চনগর খনগান সংস্থা	সহদেব সরকার	পঞ্চনগর, কুশমন্ডি, ঐ
১৫) খাগাইল খনগান সংস্থা	গীতা সরকার	খাগাইল, কুশমন্ডি, ঐ
১৬) দক্ষিণ দিনাজপুর খনগান সংস্থা	শ্যামল রায়	গঙ্গারাম পুর, ঐ
১৭) জয়নগর খন দল	ধনেশ্বর বর্মন	বীরঘই, জয়নগর, ঐ
১৮) পলাইসুরা খন দল	ভুপেন্দ্রনাথ সরকার	পলাইসুরা, রায়গঞ্জ, ঐ
১৯) ইটাহার খন দল	গোকুল দাস	ইটাহার, ঐ
২০) বন্ধুওয়ালা খন দল	তরনী মোহন বিশ্বাস	ছত্রপুর, রায়গঞ্জ, ঐ
২১) ভাই ভাই লোকসংস্কৃতি দল	সুবল ঝাঁ	মৌজগাঁও, মোহিনীগঞ্জ, ঐ
২২) দেওখন্ড খন দল	আতিয়া বর্মন	দেওখন্ড রূপাহার, ঐ
২৩) মালিবাড়ি খন দল	সুবর্ণ বর্মন	মালী বাড়ি, ভাটোল, ঐ

এছাড়াও আরও অতিরিক্ত কিছু দল হয়তো আছে, তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারিনি সময় ও যোগাযোগের অভাবে। পরবর্তীকালে সেই সব তথ্য যোগাড় করার চেষ্টা নিশ্চয়ই থাকবে আমাদের।

খনগান ঃ পরিসরের সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি লোকগান বা লোক নাট্যের যেমন নির্দিষ্ট পরিসর বা এলাকা থাকে খন গানেরও নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল নিশ্চয়ই আছে। অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর দিনাজপুর এবং রংপুর অঞ্চলই এর মূল ক্ষেত্র হলেও আমাদের আলোচনার কেন্দ্র শুধু মাত্র বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রিক। ফলে আমরা খনগানের অঞ্চলের যে পরিসর দেখতে পাচ্ছি তাতে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং উত্তর মালদার মূলত গাজোল এবং বামনগোলা থানায় খনগানের কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে এ বাংলায় খন গানের প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে কুশমণ্ডি থানাকেই চিহ্নিত করতে হয়। তা খন গানের নামের তালিকা এবং ঠিকানা দেখলেই বুঝতে পারব।

তাছাড়া তপন, গঙ্গারামপুর, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, বংশীহারি, ইটাহার, মোহিনীগঞ্জ ছাড়াও জেলায় প্রতিটি ব্লকেই এর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা আজও আছে। গম্ভীরা বা ছৌ নৃত্যের মত এদের এত প্রবল জনপ্রিয়তা রাজ্য ব্যাপি না থাকলেও অন্যান্য জেলাতেও তারা কম বেশি অনুষ্ঠান করতে যায়।

তথ্যসূত্র

১। চক্রবর্তী বরুণ কুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ - ১০৮ অপর্ণাবুকস, কোল

২। ঐ পৃ - ১০৭

৩। রায় ধনঞ্জয়, জানা অজানার দিনাজপুর, পৃ - ৬৮, নিউবইপত্র, কোল

৪। রায় ধনঞ্জয়, খন, পৃ - ০৯-১০, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল

৫। ঐ

৬। হক এনামুল, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ - ৩০৮,বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ

৭। শহীদুল্লাহ মুহাম্মদ, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, পৃ - ১১৯, ঐ

৮। মিত্র সুবল, সরল বাংলা অভিধান, নিউবেঙ্গল প্রেস, কোল

৯। বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃ - ৭১৯-৭২০, সাহিত্য অকাদেমি, কোল

১০। বসুনিয়া নারায়ণ চন্দ্র, লোকসংস্কৃতির অঙ্গন, পৃ - ১২৯, কল্যাণী পাব্লিকেশন, চাঁচল।

১১। রায় ধনঞ্জয়, খন, প্রস্তাবনা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল

১২। ঐ, প্রসঙ্গকথা।

১৩। সরকার নিমাই, মেঠোপথ, ৮ ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কাকৈর।

১৪। উত্তরের সারাদিন, ২১ অক্টবর ২০১৩, পৃ - ০৭

১৫। নিজস্ব সাক্ষাৎকার - ১৭/০৫/২০১৩

১৬। চক্রবর্তী বরুণ কুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ-১০৭, অপর্ণাবুকস।

১৭। ঐ, পৃ - ১০৮

১৮। ঐ,

১৯। চন্দ সুনীল, দিনাজপুর কথা, পৃ - ২৮, প্রগতি লাইব্রেরি, কোল

২০। বসুনীয়া নারায়ণ চন্দ্র, লোকসংস্কৃতির অঙ্গন, পৃ - ১২৯-১৩০, কল্যানী পাবলিকেশন, চাঁচল, মালদা।

২১। বিশ্বাস রতন, উত্তরবঙ্গের লোকগান, পৃ-৩৮৪, বইওয়ালা, কোল

২২। ঐ, পৃ - ৩৮৩

২৩। চৌধুরী আর্য্য, উত্তরবঙ্গের মাটি ও মানুষেরগান, পৃ - ২৪২, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল

২৪। রায় সৌরভ, নিজস্ব সাক্ষাৎকার, 'ঊষাভানু' খনগানের দল পরিচালক, কুশমন্ডি, ৭/১১/১৪

২৫। সিং অনিল, নিজস্ব সাক্ষাৎকার, 'চাকাইশ্বরী' চলচ্চিত্র নির্মাতা, কুশমন্ডি, ৯/৭/১৪

২৫ক। সরকার খগেন্দ্র নাথ, সাক্ষাৎকার, কুশমন্ডি।

২৬। চন্দ সুনীল, দিনাজপুর কথা, পৃষ্ঠা - ২৯, প্রাগুক্ত।

২৭। খন, পৃ-২০ প্রাগুক্ত

২৮। চক্রবর্ত্তী বরুণ কুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ-১০৯, প্রাগুক্ত।

২৯। বসুনিয়া নারায়ণ চন্দ্র লোকসংস্কৃতি অঙ্গন, পৃ-১৩০ প্রাগুক্ত

৩০। চন্দ সুনীল, দিনাজপুর কথা, পৃ - ২৪, প্রাগুক্ত

৩১। চক্রবর্তী বরুণ বঙ্গীয় শব্দ কোষ, পৃ - ১১০,১১১ প্রাগুক্ত

৩২। ঐ, পৃ - ১০৯

৩৩। রায় ধনঞ্জয়,খন, পৃ-১৫, প্রাগুক্ত

৩৪। ঐ, পৃ-১৪

৩৫। বিশ্বাস রতন, উত্তরবঙ্গের লোকগান, পৃ - ৩৯৩, প্রাগুক্ত

৩৬। রায় ধনঞ্জয়, খন, পৃ - ২৭ প্রাগুক্ত

৩৭। বসুনীয়া নারায়ণচন্দ্র, লোকসংস্কৃতির অঙ্গন, পৃ - ১৩১, প্রাগুক্ত

৩৮। খন, পৃ-২৯, প্রাগুক্ত

৩৯। বিশ্বাস রতন, উত্তরবঙ্গের লোকগান, পৃ-৩৯০, প্রাগুক্ত

৪০। ঐ, পৃ-৩৯৩, প্রাগুক্ত

৪১। রায় ধনঞ্জয়, খন, প্রাগুক্ত - পৃ-২৪-২৫

৪২। চক্রবর্তী বরুন কুমার, পৃ - ১০৯, প্রাগুক্ত